বিশ্বব্যাংকের 'ডিজিটাল ডিভিডেন্ড' প্রতিবেদন

ইন্টারনেট সেবা-বঞ্চিতদের মধ্যে বাংলাদেশ পঞ্চম

সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত ভারতীয়রা

গোলাপ মুনীর .....

গত ১৬ মে রাজধানীর একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৬ : ডিজিটাল ডিভিডেন্ডস' শীর্ষক প্রতিবেদন। একই সাথে প্রতিবেদনটির মুঠোফোন অ্যাপভিত্তিক সংস্করণের উদ্বোধন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান-বিষয়ক কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফান এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

ডিজিটাল টেকনোলজি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু ডিজিটাল ডিভিডেন্ড– অর্থাৎ এসব টেকনোলজির ব্যাপকতর ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক উপকার বয়ে আনার কাজটি এগিয়ে যেতে পারেনি সেভাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং উন্নত হয়েছে সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা। এরপরও ইন্টারনেটের সামগ্রিক ইতিবাচক প্রভাবে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। এর প্রভাব সবখানে সমভাবে আপতিত হয়নি। সবখানে সবার জন্য ডিজিটাল টেকনোলজির সুফল পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন অবশিষ্ট ডিজিটাল ডিভাইড কমিয়ে আনা। ডিজিটাল টেকনোলজির উদ্ভব থেকে সর্বোচ্চ উপকার পেতে হলে একটি দেশকে মনোযোগ দিতে হবে অ্যানালগ কমপ্লিমেন্টেসের ওপর। আর তা করতে হবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার বিধিবিধান জোরালো করে তোলে, নয়া অর্থনীতির চাহিদা মেটানোর উপযোগী দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বলতে গেলে এই হচ্ছে আলোচ্য প্রতিবেদনের মূল সুর।

আলোচ্য রিপোর্টটি ৩৫৯ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। রিপোর্টটি উপস্থাপিত হয়েছে দুটো ভাগে ৬টি অধ্যায়ের মাধ্যমে। ফ্যাক্টস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস শিরোনামবিশিষ্ট প্রথম ভাগের তিনটি অধ্যায়ের যথাক্রমিক বিষয়– এক্সেলারেটিং গ্রোথ, এক্সপান্ডিং অপরচ্যুনিটিজ এবং ডেলিভারিং সার্ভিস। পলিসিজ শিরোনামবিশিষ্ট দ্বিতীয়ভাগের অধ্যায় তিনটির যথাক্রমিক শিরোনাম হচ্ছে– সেক্টরাল পলিসিজ, ন্যাশনাল প্রায়োরিটিজ এবং গ্লোবাল কোঅপারেশন। সহজেই অনুমেয় এই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনের বিস্তারিতে যাওয়ার অবকাশ বক্ষমাণ লেখায় নেই। আমরা এখানে রিপোর্টের বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি, রিপোর্টের সামগ্রিক দিক ও আরও কয়েকটি চুম্বকাংশ তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংকের এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়– ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি ৮০ লাখ লোক ইন্টারনেট সুবিধা পান না। ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ পঞ্চম। বিশ্বব্যাংকের ভাষায় এ বিপুলসংখ্যক মানুষকে 'অফলাইন পপুলেশন' বা ইন্টারনেটবঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়– ইন্টারনেট ব্যবহার সুবিধা দিতে বিশ্বে সবচেয়ে পিছিয়ে ভারত। সে দেশে ১০৬ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দেশ হচ্ছে যথাক্রমে চীন, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান। আর এরপরই পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, বিশ্বে বর্তমানে ৩২০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এর মধ্যে ১১০ কোটি মানুষ ব্যবহার করে দ্রুতগতির ইন্টারনেট। প্রতিবেদন মতে, বিশ্বে এক দশক সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা তিনগুণ হারে বাড়ছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রতিবেদনে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটি। কিন্তু এদের বেশিরভাগই ইন্টারনেট ব্যবহার সুবিধা পান না। রিপোর্ট মতে, বর্তমান আইসিটি খাতে যে কর্মসংস্থান হয়, তা বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের আধা শতাংশেরও কম, যদিও বাংলাদেশে ডিজিটাল টেকনোলজি ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুতগতিতে। এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই নিম্নহার থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। দ্রুতগতির ইন্টারনেটের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো ও মুঠোফোনে ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার চালু করতে বাংলাদেশ এখনও বেশ পিছিয়ে আছে। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটিই মুঠোফোনের গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশ্বব্যাংক বলেছে, ডিজিটাল টেকনোলজিতে দেশের মানুষের প্রবেশ বাড়িয়ে বাংলাদেশ এর প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সরকারি সেবার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে।

বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং আর্থিক সেবাকে গরিব জনগোষ্ঠীর মাঝেও সম্প্রসারিত করেছে। এ ছাড়া সরকার চালু করেছে ই-জিপি তথা 'ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট' ব্যবস্থা। উপজেলা পর্যায়ের দরপত্রদাতারাও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নতুন এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে। এর ফলে টেন্ডারের ক্ষেত্রে তাদের খরচ কমেছে এবং সময়েরও সাশ্রয় হচ্ছে। সরকারি ক্রয়ে এসেছে অধিকতর ট্রান্সপারেন্সি ও প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া সরকার স্থাপন করেছে দেশের প্রথম জাতীয় ডাটা সেন্টার। এটি ২শ'র মতো সরকারি ওয়েবসাইট হোস্ট করে। সরকারি খাতের আইসিটি ব্যবহার করে এটি নিশ্চিত করে উঁচুমানের বিশ্বাসযোগ্যতা।

বিশ্বব্যাংকের এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের খরচের হার অনেক কম, যদিও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ এখন অনেক বেশিই রয়ে গেছে। প্রতিমাসে মোবাইল ফোনের যে খরচ হয়, সে বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রতিবেদন মতে, বাংলাদেশে একটি মোবাইল ফোন ব্যবহারে গড়ে মাথাপিছু খরচ ২ ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে আছে শ্রীলঙ্কা। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় ব্রাজিলে– প্রতিমাসে ৫০ ডলারের মতো।

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্য আমদানির ওপর শুল্ক আরোপের বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে আলোচ্য প্রতিবেদনে। এ সম্পর্কে প্রতিদেনটিতে বলা হয়েছে– মোবাইল ফোন আমদানিতে সবচেয়ে বেশি শুল্ক দিতে হয় এমন ১৫টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তমে। এ তালিকার শীর্ষে আছে ফিজি।

আলোচ্য রিপোর্টে বলা হয়েছে, বংলাদেশে ▸

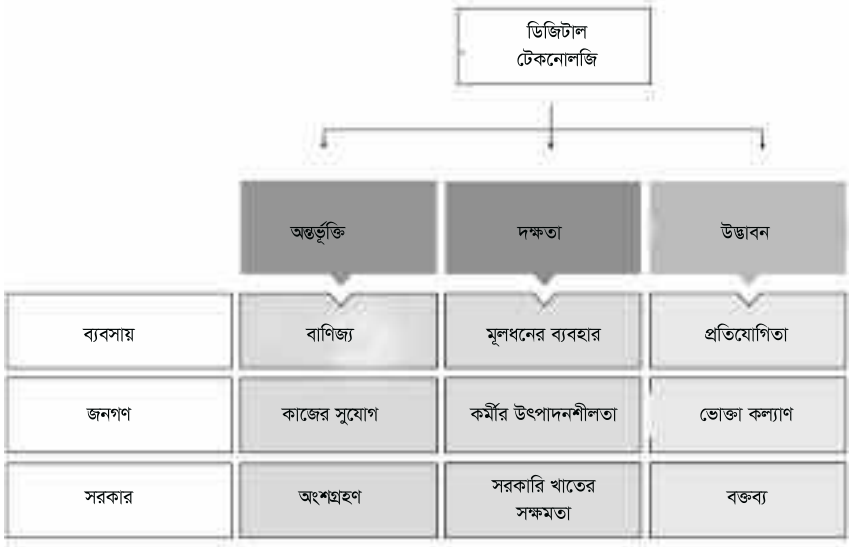

সূত্র : বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৬ টিম

মাত্র ১ কোটি ৮০ লাখ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) দেয়া তথ্যমতে, চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশে সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ১২ লাখ। বিটিআরসি'র সংজ্ঞা মতে, ৯০ দিন বা তিন মাসের মধ্যে একজন ব্যক্তি একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করলেই তাকে সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

আলোচ্য রিপোর্ট ও বিটিআরসি'র দেয়া তথ্যের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যায় এতটা পার্থক্য কেন–এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের জবাবে প্রতিবেদনের সহ-পরিচালক দীপক মিশ্র বলেন– বিশ্বব্যাংক বৈশ্বিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকে। বিশ্বব্যাংকের কাছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংজ্ঞা হলো– একজন ব্যবহারকারীকে নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হতে হবে। অফিসের পাশাপাশি নিজের বাসায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা থাকতে হবে। তিনি বলেন, সময়ের পার্থক্য থাকার কারণে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যায় পার্থক্য থাকতে পারে। তবে আমাদের প্রতিবেদনটি একটি বৈশ্বিক প্রতিবেদন। অতএব আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়েছে বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য ডাটা।

প্রতিবেদনের সামগ্রিক দিক

এই প্রতিবেদনে উদঘাটন করা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির কী প্রভাব রয়েছে তা। এতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে– কী করে সক্রিয় নাগরিক ও কার্যকর সরকারগুলো দুনিয়াকে পাল্টে দিতে পারে : 'হাউ অ্যাকটিভ সিটিজেনস অ্যান্ড ইফেক্টিভ স্টেটস ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড।' কীভাবে দারিদ্র্য থেকে উঠে এসে একটি দেশ পরিণত হতে পারে শক্তিতে : 'ফ্রম পোভার্টি টু পাওয়ার'। এই হচ্ছে এই প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য।

রিপোর্টের শিরোনাম 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৬ : ডিজিটাল ডিভিডেন্ডস'। এই 'ডিজিটাল ডিভিডেন্ডস' কী? এর জবাবে বলা হয়েছে প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সেবা হচ্ছে ডিজিটাল বিনিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বা ডিভিডেন্ডস। কী করে ডিজিটাল প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং সৃষ্টি করে এই 'ডিজিটাল ডিভিডেন্ডস'? তথ্যের খরচ কমিয়ে এনে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যাপকভাবে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারি খাত পর্যায়ে কমিয়ে আনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক লেনদেনের খরচ। ডিজিটাল টেকনোলজি কার্যত লেনদেন খরচ প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে। এর ফলে তা উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে। প্রযুক্তি মানুষের দক্ষতা বাড়ায়।

রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করে বলা হয়েছে– ডিজিটাল ডিভিডেন্ড পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসার লাভ করছে না। কেন এমনটি বলা হলো? এর কারণ দু'টি: প্রথমত, এখনও বিশ্বজনসংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশি অফলাইনে থেকে গেছে। এরা পুরোপুরি ডিজিটাল ইকোনমিতে অংশ নিতে পারছে না। প্রতিটি দেশে এখনও নারী-পুরুষের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে প্রবল ডিজিটাল ডিভাইড। ভৌগোলিক, বয়স ও আয় বিবেচনায়ও ডিজিটাল ডিভাইড এখনও দূর করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেটের অর্জিত উপকারের মধ্যে কিছু কিছু উপকার নতুন নতুন ঝুঁকির কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কায়েমি ব্যবসায়ী স্বার্থ, বিধি-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা এবং ডিজিটাল প্লাটফরমে সীমিত প্রতিযোগিতা বিভিন্ন খাতেই ক্ষতিকর ঘনায়ন বা কনসেন্ট্রেশন সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি মাঝারি পর্যায়ের অফিসেও দ্রুত অটোমেশন সম্প্রসারণ লেবার মার্কেটে শূন্যতার সৃষ্টি করতে পারে। বাড়াতে পারে বৈষম্য। আর ই-গভর্নমেন্ট সংক্রান্ত পর্যাপ্ত পদক্ষেপের অভাব নির্দেশ করে আইসিটি প্রকল্পের বড় মাত্রার ব্যর্থতা। আর এমন ঝুঁকি রয়েছে– রাষ্ট্র ও কর্পোরেশন ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, জনগণের উন্নয়ন নয়।

এসব ঝুঁকির তীব্রতা প্রশমনে বিভিন্ন দেশের কী করা উচিত? কানেকটিভিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। ডিজিটাল ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন অ্যানালগ কমপ্লিমেন্ট বা পরিপূরক– রেগুলেশন, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনে ইন্টারনেট সুবিধা কাজে লাগাতে পারে; উন্নীত দক্ষতা, যাতে মানুষ ডিজিটাল সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান, যাতে নাগরিক-সাধারণের চাহিদা মেটাতে সরকার সাড়া দিতে পারে। অপরদিকে ডিজিটাল টেকনোলজি উন্নয়নের মাত্রা প্রসারিত করে এসব পরিপূরক বাড়িয়ে তুলতে পারে।

আনকানেক্টেডদের কানেক্ট করতে কী করা দরকার? বাজার প্রতিযোগিতা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, ইন্টারনেট ও মোবাইলের কার্যকর বিধিনিয়ন্ত্রণ ও মোবাইল অপারেটরদেরকে বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, ইন্টারনেট অ্যাক্সেসকে সার্বজনীন ও কম খরচে পাওয়ার যোগ্য করে তুলতে পারবে।

তাহলে এ প্রতিবেদনের মূল উপসংহারটি কী? ডিজিটাল উন্নয়ন কৌশলগুলোকে আইসিটি কৌশলগুলোর চেয়ে অধিকতর পরিসরের করতে হবে।

অনলাইন আউটসোর্সিংয়ের অর্থনীতি

আলোচ্য রিপোর্টে বলা হয়েছে– অনলাইন আউটসোর্সিং অথবা ফ্রিল্যান্সিং প্লাটফরমগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে অনলাইনে কাজ করার সুযোগ দেয়। এর ফলে কর্মদাতা ও কর্মী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগের খরচ ও সময় উভয়ই কমে। আপওয়ার্কের মাধ্যমে বেশিরভাগ প্লাটফর্মই কর্মী ভাড়া করার সময়টা ৪৫ দিন থেকে কমিয়ে তিন দিনে নামিয়ে আনতে পারে। আপওয়ার্কে নিয়োজিত দু'টি মূল প্লাটফরমের মধ্যে অন্যতম প্লাটফরম ওডেস্ক ই-ল্যান্সের সাথে মিলে ঘণ্টায় যা আয় করে, তা উন্নয়নশীল দেশের ঘণ্টাপ্রতি গড় আয়ের ১৪ গুণ। এর আংশিক ব্যাখ্যা মিলে এই ঘটনা থেকে– সাধারণ অর্থনীতির কর্মীদের চেয়ে অনলাইন কর্মীরা অধিকতর শিক্ষিত। উঁচু বেতনের কর্মীরা বেশি সংশ্লিষ্ট থাকে আইসিটির কাজে, যেমন– সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজে। অনলাইনে লিখে বা অনুবাদ করে যা আয় করা যায়, এর মাধ্যমে তার চেয়ে দ্বিগুণ আয় করা যায়। এমনকি গ্রাহক সহায়তা ও বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত আয়ের তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি। ইন্টারনেট এবং মনিটরিংয়ে উদ্ভাবন ও ফেসবুক সিস্টেমের সুবাদে অনলাইন শ্রমবাজার এখন বৈশ্বিক হয়ে উঠছে। অনলাইন জব প্লাটফরমগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য– বিশেষত ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ট্যালেন্টপুল বাড়িয়ে চলেছে। এসব জব প্লাটফরম সুযোগ এনে দিচ্ছে দক্ষতা চালু করার। ৯০ শতাংশ কাজই অপশোর করা হয়। বড় বড় প্লাটফরমে বেশিরভাগ এমপ্লয়ারই উন্নয়নশীল দেশের। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় এমপ্লয়ার। জনসংখ্যা বিবেচনায় ওডেস্কে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কন্ট্রাক্টর।

এরপরও ইন্টারনেট শ্রমবাজারের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র দখল করতে পেরেছে। এ ছাড়া অনলাইন শ্রমবাজারের বাধাগুলোর অল্পই দূর ▸

করেছে। আপওয়ার্কে একজন কর্মীর অভ্যন্তরীণ বাজারে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা ১.৩ গুণ। আর অভ্যন্তরীণ কন্ট্রাক্টরেরা একই ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক কন্ট্রাক্টরদের তুলনায় বেশি অর্থ পান।

রেমিট্যান্সের ওপর ডিজিটাল টেকনোলজির প্রভাব

অনলাইন ও মোবাইল মানি ট্রান্সফার সিস্টেম উপহার দিয়েছে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে নতুন ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়। কেনিয়ায় ৫৩ শতাংশ মানুষ গত বছর রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আজকের দিনে যে অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে পাঠানো হয়, তার ৮ শতাংশ খরচ হয় পাঠানোর খাতে। মোবাইল টেকনোলজি এই খরচ নামিয়ে আনতে পারে স্টাফ ও গ্রাহকের সশরীরে উপস্থিতি এড়ানোর মাধ্যমে। অপরদিকে মোবাইলের মাধ্যমেও সময় মতো নিরাপদে অর্থ লেনদেন নিশ্চিত করা যায়।

ডিজিটাল টেকনোলজি আভন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে অর্থ পাঠানোর বিষয়টিকে সস্তাতর করে তুলছে। ২০০৮ সালে কেনিয়ার বাজারে প্রবেশ করে এম-পেসা (M-Pesa)। তখন এর মাধ্যমে দেশের ভেতরে ১০০ ডলার পাঠাতে খরচ হয় মাত্র ২.৫০ ডলার। কিন্তু তখন মানিগ্রামের মাধ্যমে ১০০ ডলার পাঠাতে খরচ হতো ১২ ডলার, ব্যাংক ওয়্যারের মাধমে খরচ হতো ২০ ডলার, পোস্টাল মানি অর্ডারের মাধ্যমে পাঠাতে খরচ হতো ৬ ডলার এবং বাসে পাঠাতে খরচ হতো ৩ ডলার। ক্যামেরুনে মোবাইল মানি বাজারে প্রবেশ করার পর এই খরচ ২০ শতাংশ কমেছে। আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রেও এই খরচ কমেছে। ইউকে-বাংলাদেশ করিডোরে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে ২০০ ডলার পাঠাতে ২০০৮ সালে খরচ হতো এর ১২ শতাংশ। ডিজিটাল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর ২০১৪ সালে তা নেমে এসেছে ৭ শতাংশে। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে অনলাইনে অর্থ পাঠানোর জন্য Xoom চার্জ ৪ শতাংশ, যেখানে ওয়েস্টার্ন মানি ইউনিয়নের বেলায় এই চার্জ ৬.২ শতাংশ। কিন্তু গরিবদের জন্য অর্থ পাঠানো এখনও ব্যয়বহুল। কারণ, এরা পাঠায় খুব কম পরিমাণ অর্থ। ৫ ডলারের কম পাঠাতে তাদের খরচ গুণতে হয় ৫ শতাংশ। সেখানে এখন রেমিট্যান্স সার্ভিস প্রোভাইডারেরা গড়ে তুলছেন নিজস্ব মোবাইল ও অনলাইন সক্ষমতা। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল রেমিট্যান্স সার্ভিস এখনও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চালু হয়নি। ২০১২ সালের হিসাব মতে, বিশ্বব্যাপী ১৩০টি মোবাইল ব্যাংকিং অপারেটরের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ সার্ভিস চালু করেছে। ২০১৩ সালের হিসাব মতে, বিশ্বের মোট রেমিট্যান্সের মাত্র ২ শতাংশ লেনদেন হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

এখানে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নীতি-পদক্ষেপ নেয়া দরকার। প্রথমত, বিভিন্ন দেশের সাথে উদ্ভাবনীমূলক ক্রস-বর্ডার মোবাইল মানি ট্রান্সফার প্রযুক্তি চালু করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাংক ব্যবসায় ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মধ্যে সাযুজ্যকরণ বা সমন্বয় সাধন, যাতে ব্যাংকগুলো মোবাইল মানি ট্রান্সফারে অংশ নিতে পারে। মোবাইল কোম্পানিগুলো আলাদা কোনো চুক্তি ছাড়াই সুযোগ পায় মানি সার্ভিসের। সেই সাথে টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ছোট আকারের আমানত জমা রাখতে পারে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে।

এর জন্য আরও প্রয়োজন ক্ষুদ্র অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসের অর্থায়ন রোধসহ বিধি-নিয়ন্ত্রণের সরলায়ন। প্রয়োজন সব মাল্টিপল ইন্টারন্যাশনাল রেমিট্যান্স সার্ভিস প্রোভাইডারের জন্য মাল্টিপল মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন উন্মুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, টেলিকম মনোপলি ও এক্সক্লুসিভিটি কন্ট্রাক্টের অবসান ঘটিয়ে প্রতিযোগিতা বাড়ানো। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো করিডোরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কীভাবে ওয়েস্টার্ন মানি ইউনিয়ন ও ইলেকট্রার (Elektra) মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ কমিয়ে আনা যায়। ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও তাঞ্জানিয়ার মানি ট্রান্সফার মার্কেটের মতো মানি ট্রান্সফার অপারেটরদের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি এ খরচ আরও কমিয়ে আনতে পারে।

কোনো মাধ্যমিক পণ্য বা সেবা তৈরির ও এক্সচেঞ্জের ব্যয় বাজারে এই এক্সচেঞ্জ থেকে আসা মুনাফার চেয়ে বড় থাকবে, ততক্ষণ এই ফার্মের জন্য এই পণ্য বা সেবা নিজেরা তৈরির যৌক্তিকতা থাকে। অনেক বছর পর ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল টেকনোলজি এসব খরচ ব্যাপকভাবে কমিয়ে এনেছে। কিন্তু এই প্রথম টেকনোলজির সংজ্ঞা এসেছে আলোচ্য এই প্রতিবেদনে। তবে এই প্রতিবেদন নির্দিষ্ট কোনো টেকনোলজির ওপর নয়। সাধারণভাবে এটিতে এসেছে ডিজিটাল টেকনোলজি ও সার্ভিসের প্রভাবের বিষয়টি, যা ব্যাপকভাবে সহায়ক হয় গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্রিয়েশন, স্টোরেজ, অ্যানালাইসিস ও শেয়ারিংয়ে। রিপোর্টে 'ডিজিটাল টেকনোলজি, ইন্টারনেট ও কখনও কখনও আইসিটি ইত্যাদি পদবাচ্য ব্যবহার হয়েছে পরস্পর বিনিময়যোগ্য হিসেবে। ইন্টারনেটের কেন্দ্রীয় তাগিদ কানেকটিভিটি। নিজস্ব অধিকার বলেই দ্রুততর গতির কমপিউটার ও সস্তাতর স্টোরেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে কারণে এসব টেকনোলজির জীবনের প্রায় সব

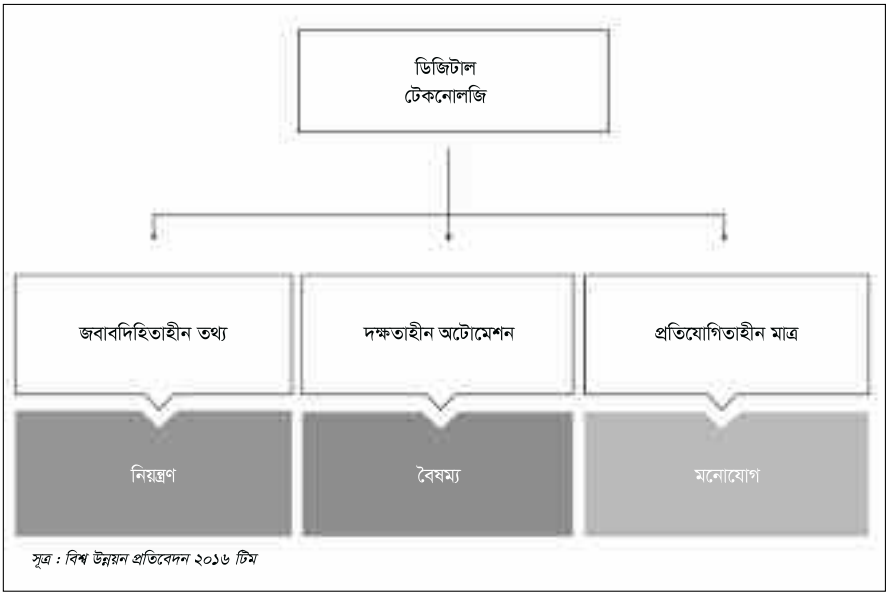

সূত্র : বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৬ টিম

ইন্টারনেট যেভাবে উন্নয়নের সহায়ক

ইন্টারনেট ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কী করে উন্নয়নের ওপর প্রভাব ফেলে, তা বুঝতে হলে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এগুলোর কাজ কী তা বোঝা। পুরনো অর্থনীতি ভালো করেই ব্যাখ্যা তুলে ধরে নতুন অর্থনীতির। ১৯৯১ সালের অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী রোনাল্ড কোজি ১৯৩৭ সালে প্রকাশ করেন তার 'দ্য নেচার অব ফার্ম' নামের বইটি। এই বইয়ে প্রশ্ন রাখা হয়– 'হোয়াই ফার্মস এক্সিস্ট'। যদিও অর্থনীতির বিবেচনায় বাজার অত্যন্ত কার্যকরভাবে সুসংগঠিত করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তবু বড় বড় কোম্পানির প্রবণতা হচ্ছে একটি 'সেলফ-কনটেইন্ড কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোলড' পরিবেশে কাজ করা। রোনাল্ড কোজির উপলব্ধি ছিল, প্রাইস মেকানিজম ব্যবহার করে ডেকে আনা হয়েছে বেশকিছু অতিরিক্ত ব্যয়। যেমন– ক্রেতা ও সরবরাহকারী পাওয়ার উদ্যোগের খরচ এবং চুক্তি সমঝোতায় পৌঁছা ও এর বাস্তবায়নের খরচ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রেই এই ব্যাপক প্রভাব, তা হচ্ছে– ডিভাইসগুলো এমনভাবে লিঙ্ক করা যাতে ইনফরমেশনে সহজেই প্রবেশ করা যায় ও ইনফরমেশন সরবরাহ করা যায় যেকোনো স্থান থেকে।

টেকনোলজি উন্নয়ন ঘটায় সংশ্লিষ্টতা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের। টেকনোলজির উন্নয়নের ফলে ব্যাপকভাবে কমেছে খরচ এবং বাড়িয়েছে সেইসব ডিজিটাল টেকনোলজির গতি, যা চালিত করে ইন্টারনেটকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই খরচ কমেছে বছরে ৩০ শতাংশ। কমপিউটিংয়ের খরচ কমে যাওয়া দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে। এর ফলে কমেছে লেনদেন ও উৎপাদন খরচ। এই লেনদেন খরচ কমিয়ে ইন্টারনেট ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর তিনটি প্রধান পরস্পর-সংশ্লিষ্ট উপায়ে। একটি হচ্ছে– তথ্য-সমস্যা দূর করতে ইন্টারনেট সহায়তা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেট সহায়তা করছে সেইসব ক্ষেত্রে, যেখানে লেনদেন খরচ অতিমাত্রায় বেশি। ▶

নজরে রাখতে হবে ৬ প্রযুক্তি

রিপোর্টে আলোকপাত করা হয়েছে– একটি দেশ ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল টেকনোলজি থেকে কীভাবে আরও বেশি করে উপকৃত হতে পারে। এই প্রতিবেদনের প্রত্যাশা এমন এক বিশ্ব, যেখানে ইন্টারনেট সার্বজনীনভাবে হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে, কিন্তু বিশ্লেষণে টেকনোলজিকে আমলে নেয়া হয়েছে। তবে প্রাযুক্তিক পরিবর্তন অবিরত এবং মাঝে-মধ্যেই বাধার মধ্যে পড়ে। রিপোর্টে আলোকপাত রয়েছে ছয় ধরনের প্রযুক্তির ওপর, যেগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে উন্নয়নের ওপর। তাই তাগিদ দেয়া হয়েছে এগুলোর ওপর সচেতন নজর রাখার।

ফাইভ-জি মোবাইল ফোন : ১৯৭০ সালে সেলুলার ফোনের বাণিজ্যিক সেবা শুরু হওয়ার পর তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শুধু এগিয়েই চলছে। ১৯৯১ সালে ফিনল্যান্ডে সূচনার মাধ্যমে প্রথম জেনারেশনের (১জি) অ্যানালগ টেলিফোনের জায়গা দখল করে টুজি ডিজিটাল ফোন। এরপর আরও দ্রুতগতির ইন্টারনেট নিয়ে এলো থ্রিজি ফোন, যা প্রথম চালু করা হয় কোরিয়ায় ২০০২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ

ফুটবল খেলায়। ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে বিশ্বে থ্রিজি মোবাইলের গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৩ কোটি। আর এ সময়ে আরও ডাটা অপটিমাইজড ফোরজি বা এলটিইর (লং টাইম টেকনোলজি) গ্রাহক হয় ৭৫ কোটি ৭০ লাখ। আশা করা হচ্ছে, এর পরবর্তী প্রজন্মের ফাইভ-জি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ফোরজি টেকনোলজিকে পেছনে ফেলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশ' গিগাবিট (Gbit/s) ডাটা সঞ্চালন করবে। ২০১৫ সালে সুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইভ-জি ইনোভেশন সেন্টারের (5GIC) গবেষকেরা স্পিড টেস্টের সময় প্রতি সেকেন্ডে ১ টেরাবিট (Tbit/s) ডাটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম হন। এটি বর্তমান ডাটা কানেকশনের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি গতিসম্পন্ন। এই ফাইভ-জি অ্যাকোমডেট করতে স্পেকট্রামের অংশবিশেষ ব্যবহার করতে হতে পারে, এর আগে কখনই ভাবা হয়নি যে এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হবে। বিশেষ করে তিন গিগাহার্টজের ওপর বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের কথা ভাবা হয়নি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) সংজ্ঞায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণত এআই বলতে একটি কমপিউটার সিস্টেমকে বুঝায়, যা এমন কাজ করতে সক্ষম, যেগুলো করতে মানববুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এই কমপিউটার সিস্টেম ভিজ্যুয়াল ও স্পিচ রিকগনাইজ করতে পারে। ফাস্টার কমপিউটিং, বিগডাটা এবং উন্নততর অ্যালগরিদম সম্প্রতি সহায়ক হয়েছে এআই টেকনোলজিকে আরও সামনে এগিয়ে নেয়ায়। অ্যালগরিদম এখন আরও ভালোভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ও ইমেজ বুঝতে পারে। ন্যারেটিভ সায়েন্সের মতো প্রতিষ্ঠান এআই ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় করে তুলেছে আর্থিক প্রতিবেদন লেখার কাজ।

আইবিএমের ওয়াটসন কমপিউটার এআই ব্যবহার করে চিকিৎসকদের সহায়তা করে ডায়াগনস্টিক কর্মকাণ্ডে। এটি দিচ্ছে কাস্টমাইজ মেডিক্যাল অ্যাডভাইস। ভয়েস রিকগনিশনে সক্ষম ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টেরা অ্যাপলের 'সিরি' ও মাইক্রোসফটের 'কর্টানা'র মতো ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করছে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক কাজে।

এআইয়ের দ্রুত অগ্রগতিতে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে– যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে

ছাড়িয়ে যাবে কি না, তখন যন্ত্র কি ভবিষ্যৎ মানবসমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে? একটি উদাহরণ হলো– ২০১৪ সালে নিক বস্ট্রমের লেখা সুপারইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত একটি বই। এই বইয়ে বলা হয়েছে, এআই জোরালোভাবেই মানবজাতির জন্য একটি 'এক্সিজটেনশিয়াল রিস্ক'। অর্থাৎ এআই মানবজাতির অস্তিত্বকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে।

এলেন মাস্ক, স্টিফেন হকিং ও বিল গেটসের মতো আলোকিতজনেরাও এআইকে একটি বিপদ হিসেবে দেখছেন। এআইয়ের বিপদ-ঝুঁকি থাকলেও এর অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে উন্নয়নের প্রতিটি খাতে গুরুত্বপূর্ণ মূল্য সংযোজনের। এআইয়ের উপকারিতা দৃশ্যমান শিক্ষার ক্ষেত্রে। এর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যক্তিগতায়ন চলছে স্বাস্থ্য, ডায়াগনস্টিক, ফসল পরিকল্পনা, যথার্থ কৃষিকর্ম এবং সম্পদ ব্যবহারকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যেতে এবং ব্যাংক ব্যবসায় ও বীমা ব্যবসায়, গ্রাহকসেবায় ও ঝুঁকি মোকাবেলায়।

এআইয়ের অগ্রগতি সুযোগ সৃষ্টি করবে মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টিতে। একই সাথে মানুষ হারাবে প্রচলিত ধরনের কাজ। যেমন চাকরি হারাতে পারেন– আইনি বিশ্লেষক, আর্থিক ও খেলাধুলা-বিষয়ক ▸

ই-কমার্স প্লাটফরমের আবির্ভাব এই কাজটিকে অনেকটা সহজ করে এনেছে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র পণ্যের উৎপাদকেরা সহজেই গ্রাহক পাচ্ছে। এমনকি যারা প্রচলিত বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্য প্রদর্শনী করার সুযোগ পান না, তারাও উপকৃত হচ্ছেন ই-কমার্স প্লাটফরমের মাধ্যমে।

ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে কমিয়ে এনেছে সার্চ ও ইনফরমেশন খরচ। এমনকি সার্চের ব্যয় কম হলেও লেনদেন অনেক সময় সংঘটিত হয় না, যখন লেনদেনের একটি পক্ষের থাকে অপর পক্ষের চেয়ে অনেক বেশি ইনফরমেশন। গরিব কৃষকদের ঋণ দেয়ার উদাহরণটির কথাই ভাবুন। ঋণ-সম্পর্কিত ইনফরমেশন পাওয়া উঁচু খরচের কারণে এরা ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না। তাই গরিব চাষিদেরকে নির্ভর করতে হয় চড়া সুদের মহাজনী ঋণের ওপর। কিন্তু আজকের দিনে অনেক গরিব চাষির হাতে রয়েছে মোবাইল ফোন। সিগনিফি (Cignifi) নামের কোম্পানি একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এর সাহায্যে ঋণ পাওয়ার উপযোগিতা যাচাই করা যায় মোবাইল ফোনের রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে। ঘানায় সিগনিফি কাজ করছে 'ওয়ার্ল্ড সেভিংস অ্যান্ড রিটেইল ব্যাংকিং ইনস্টিটিউটে'র সাথে মোবাইল ফোন রেকর্ডের মাধমে সঞ্চয় আচরণ সমন্বয় করার জন্য। ইন্টারনেট অপরিমেয় দক্ষতা এনে দিয়েছে ব্যবসায়ের উন্নয়নে। ব্যবসায়ে সামগ্রিকভাবে উপকার বয়ে এনেছে ইন্টারনেট। উন্নততর যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনায় ইন্টারনেটের অবদান অপরিসীম। খুচরা বিক্রেতারা পয়েন্ট-অব-সেল ডাটা বিশ্বব্যাপী রিয়েল টাইমে শেয়ার করে ভেন্ডরদের সাথে। এর মাধ্যমে এরা এদের ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট স্থানান্তর করছে তাদের পরিবেশকদের ওপর। ট্র্যাকিং, নেভিগেশন ও শিডিউলিং সফটওয়্যার লজিস্টিক ও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ক্যাপাসিটি ব্যবহারের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। ডেলিভারি কোম্পানি ইউপিএস রাউটিং টেকনোলজি ব্যবহার করে সাশ্রয় করেছে প্রায় বছরে ১০ লাখ গ্যালন গ্যাস। এস্তোনিয়ার এক্স-রোড হচ্ছে একটি ই-সরকার ব্যবস্থা, যা অনলাইনে নাগরিক-সাধারণকে জোগান দিচ্ছে ৯০০ সরকারি-বেসরকারি খাতের এজেন্সি থেকে ৩০০০ সার্ভিস। এক্স-রোডের জিজ্ঞাসা বা কুয়েরির সংখ্যা ২০০৩ সালে ছিল ৫ লাখ। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ কোটি। এর ফলে প্রতিজন নাগরিক সাশ্রয় করে বছরে পাঁচটি কর্মদিবস। এর ফলে সে দেশে বছরে যোগ হয় মোট ৭০ লাখ কর্মদিবস।

তৃতীয় কৌশলটি সংশ্লিষ্ট 'নিউ ইকোনমি'র ▸

▸ সাংবাদিক, অনলাইন বাজারি, অ্যানেসথেলজিস্ট, ডায়াগনস্টিশিয়ান ও আর্থিক বিশ্লেষক। একইভাবে বিপুলসংখ্যক কলসেন্টার, যারা অপশোর করত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, ক্রমবর্ধমান হারে কাজ হারাতে পারে অভিজাত ধরনের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং সিস্টেমের কারণে। এই সিস্টেম মানুষের কাজের বিকল্প হবে। যেমন– স্পেনের ব্যাংক বিবিভিএ লোলা (Lola) নামের একটি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করেছে। এটি প্রতিদিনের অনেক নিয়মিত কাজ গ্রাহকদের অনুরোধে করে থাকে। আগে এ কাজ করত কলসেন্টার এজেন্টেরা।

রোবটিকস : রোবটিকস বলতে আমরা একটি যান্ত্রিক বা কারিগরি ব্যবস্থাকে বুঝি, যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সামলাতে পারে। রোবটকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়– ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট (অটোমোটিভ, কেমিক্যাল, রাবার, প্লাস্টিক ও খাদ্যশিল্প) এবং সার্ভিস রোবট (লজিস্টিকস, মেডিসিন, প্রবীণদের সহকারী, ফ্লোর-ক্লিনিং, সিভিল কনস্ট্রাকশন, কৃষি ও এক্সাস্কেলেটন)। রোবট এর কমপিউটিং পাওয়ার ও সেন্সিং ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের জন্য নানা সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ২০১৪ সাল শেষে বিশ্বে অপারেশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লাখ। আর এ সময়ে ব্যক্তিগত ও ঘরে ব্যবহারের সার্ভিস রোবট বিক্রি হয়েছে ৪৭ লাখ। রোবটগুলো প্রাথমিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে শারীরিকভাবে জটিল ও বিপজ্জনক কাজে। রোবটের সেন্সিং, ডেক্সটারিটি ও ইন্টেলিজেন্সে ব্যাপক উন্নতি ঘটছে। এগুলো এখন আরও কমপ্যাক্ট, অ্যাডাপ্টেবল ও ইন্টেলিজেন্ট। এগুলো এখন ক্রমবর্ধমান হারে মানুষের পাশাপাশি থেকে কাজ করছে। এক সময় এগুলো ম্যানুফেকচারিং, ক্লিনিং ও দেখাশোনার মতো কম-দক্ষতাসম্পন্ন কাজে মানুষের জায়গা দখল করে নেবে। এমনকি সার্জারি ও প্রসথেটিকসের মতো হাইটেকের ক্ষেত্রেও এদের দখল প্রতিষ্ঠা পাবে।

বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় আইটি কোম্পানি রোবট শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। এরা উদ্ভাবন করছে স্মার্ট রোবট। অ্যামাজন কোম্পানি কিনে নিয়েছে 'কিভা সিস্টেমস', আর এটি কিভা রোবট ব্যবহার করছে অর্ডার সরবরাহ করতে। গুগল কিনেছে 'বোস্টন ডিনামিকস' ও আরও কয়েকটি রোবটিকস কোম্পানি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটের চাহিদা বাড়ছে। কারণ, শিল্প-কারখানার মালিকেরা শ্রমিক খাতে খরচ কমাতে চান। আর বারবার করতে হয় এমন কাজ আরও যথার্থ-সঠিকভাবে করার চিন্তাভাবনা থেকেও শিল্প-কারখানায় রোবটের চাহিদা বাড়ছে। রোবটকে বেতন দিতে হয় না। শ্রমিকদের মতো এরা অসুখে পড়ে না। এরা ধর্মঘট করে না। যতক্ষণ বিদ্যুৎ আছে কিংবা যতক্ষণ এদের কাজ করানো হয়, ততক্ষণ এরা কাজ করে। এগুলোকে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও লাগানো যায়। যেমন– ল্যান্ডমাইন অপসারণের কাজ।

স্বয়ংচালিত গাড়ি : স্বয়ংচালিত গাড়ি বা অটোনোমাস ভেহিকল (এভি) নিয়ে গবেষণায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। গাড়ি কোম্পানি ছাড়াও অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সেলফ-ড্রাইভিং ভেহিকল নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। এর সমর্থকেরা যুক্তি দেখান– স্বয়ংচালিত গাড়ি সড়ক দুর্ঘটনা কমাবে (লেইন-কিপিং সিস্টেম, অটো-পার্কিং ও ক্রুজ কন্ট্রোলের মাধ্যমে), যানজট কমাবে, তেল ক্ষয় কমাবে, প্রবীণদের ও প্রতিবন্ধীদের চলাফেরা উন্নত করবে এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে যাতায়াতের সময় কমাবে। কিন্তু এর ফলে এখন যে লাখ লাখ ড্রাইভার কাজ করছে, এরা কাজ হারাবে। এর ফলে জটিল আইনি সমস্যাও দেখা দেবে। এর মধ্যে আছে লায়েবিলিটি ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কিত আইনি সমস্যা। এ ছাড়া আছে অনবোর্ড নেটওয়ার্কড কমপিউটার সিস্টেম হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি। ইউরোপীয় প্রকল্প এসএআরটিআরই কাজ করছে 'autonomous car platoons' নামে একটি ধারণা নিয়ে, যা সুযোগ দেয় মাল্টিপল ভেহিকলকে হাইওয়ে স্পিডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে পরস্পর কয়েক মিটার দূরত্বে অবস্থান করে। আর এগুলো গাইড করবে একটি প্রফেশনাল পাইলট ভেহিকল। আশা করা হচ্ছে, এই পদক্ষেপের ফলে তেলের কনজাম্পশন ও ইমিশন ২০ শতাংশ কমবে, বাড়বে সড়ক নিরাপত্তা এবং কমবে যানজট।

ড্রোনের (নামহীন অ্যারিয়েল ভেহিকল ও বিশেষ ধরনের এভি) দাম কমার কারণে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এগুলোর রয়েছে প্রতিবন্ধীদের সহায়তা, হোম ডেলিভারি, কৃষিকাজ, বিনোদন, নিরাপত্তা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পুলিশি কাজসহ অনেক সম্ভাবনাময় ব্যবহার। এমনকি এর সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সার্ভিসও দেয়া যাবে। ▸

সাথে। নতুন বিজনেস মডেল বিস্তার লাভ করছে। এর ফলে অভাবিতভাবে সার্ভিস কাস্টোমাইজেশনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ইন্টারনেট বিজনেসের ব্যয় কাঠামো (কস্ট স্ট্রাকচার) বাড়িয়ে তোলে নানা ধরনের স্কেল ইকোনমি। সাধারণত স্কেল ইকোনমি বলতে বোঝায় ব্যয়-সুবিধাকে, যা আসে পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়ার ফলে। কিন্তু সাপ্লাই-সাইড ইকোনমিতে ব্যয় কমে, যখন লেনদেন বা ট্রানজেকশনের পরিমাণ বাড়ে। তবে সাপ্লাই-সাইড ইকোনমিতে স্বাভাবিক মনোপলির উদ্ভব ঘটে। পানি ও বিদ্যুৎ পরিসেবা চলে এই পরিবেশে। অনেক ইন্টারনেটভিত্তিক বাজার, যেমন– ওয়েব সার্চ, মোবাইল পেমেন্ট কিংবা অনলাইন বুকস্টোর চলে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্যে। ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ লাখে পৌঁছে মাত্র ৫০০ প্রকৌশলী নিয়ে। ওয়ালমার্টকে তার বিক্রির পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে খুলতে হয়েছে ২৭৬টি স্টোর। অ্যামাজনকে ২০০৩ সালে ৩০০ কোটি ডলার ছুঁতে গড়তে হয়েছে ৬টি গুদামঘর। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো যে পণ্য বিক্রি করে তা একান্তভাবেই ডিজিটাল। যেমন– ডিজিটাল মিউজিক (সুইডেনে স্পটিফাই), ই-বুক (যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামাজন) কিংবা অনলাইন নিউজ বা ডাটা। অন্যরা বিক্রি করে হাইলি অটোমেটেড ব্রোকারেজ বা ট্রাভেল ম্যাচমেকিং সার্ভিস, জব, মার্চেন্ডাইজ অথবা রাইড শেয়ারিং।

স্কেল-ইকোনমির অস্তিত্ব রয়েছে ডিমান্ড সাইডেও। যত বেশি লোক যত বেশি সার্ভিস ব্যবহার করবে, ব্যবহারকারীদের জন্য তা অধিক মূল্যবান হয়ে উঠবে এবং তা আরও বেশি করে নতুন ব্যবহারকারী আকৃষ্ট করবে। কেনিয়ার এম-পেসার (M-Pesa) মতো সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বা ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমগুলো এর উদাহরণ। সাপ্লাই-সাইড স্কেল-ইকোনমিতে গড় ব্যয় কমে স্কেলের সাথে। আর ডিমান্ড-সাইড ইকোনমিতে গড় রাজস্ব আয় বা ইউটিলিটি বাড়ে স্কেলের সাথে। কিন্তু ইন্টারনেটের অর্থনীতি একটি কার্যকর দরকষাকষির জন্ম দিয়েছে প্লাটফরম মালিক, ব্যবহারকারী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে। যেহেতু প্লাটফরম মালিকেরা সার্ভিসের জন্য কোনো চার্জ নেয় না, তাই এরা আসলে ব্যবহারকারীর ওপর কোনো একচেটিয়া ক্ষমতা খাটায় না। কিন্তু এরা তা করতে পারে ভেন্ডরদের ওপর বিজ্ঞাপনের স্পেস কেনা নিয়ে। মাত্র চারটি কোম্পানি– গুগল, ফেসবুক, বাইডু ও আলিবাবা বর্তমানে পায় মোট ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের অর্ধেক আয়। ▸

▸ **ইন্টারনেট অব থিংস :** ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) বলতে বুঝায় কমপিউটিং যন্ত্রের (রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন তথা আরএফআইডি এবং সেন্সর) মাধ্যমে ইন্টারনেট অবকাঠামোর সাথে অবজেক্টের ইন্টারকানেকশন বা আন্তঃযোগাযোগ। আইওটি পণ্যকে ভাগ করা যায় পাঁচটি বৃহত্তর ভাগে– ওয়্যারেবল ডিভাইস, স্মার্টহোম, স্মার্টসিটি, এনভায়রনমেন্টাল সেন্সর এবং বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন। সিসকো অনুমিত পরিসংখ্যান মতে, ২০২০ সালের মধ্যে ১০০ কোটি ডিভাইস ও অবজেক্ট যুক্ত হবে ইন্টারনেটের সাথে। আইওটি দ্রুত পুনর্সংজ্ঞায়ন করছে সার্ভিস ডেলিভারি এবং নানা ক্ষেত্রে উদঘাটন করছে নানা সুযোগ। স্মার্ট ফিটনেস সেন্সর ও ট্র্যাকার স্বাস্থ্যসেবাকে পাল্টে দিচ্ছে, উন্নত করছে ব্যক্তিগত ফিটনেস ও হেলথ। এমবেডেড সেন্সর সঠিকভাবে জানিয়ে দিচ্ছে আর্দ্রতা, বায়ু ও পানির দূষণমাত্রা। এর ফলে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ রাখা যাচ্ছে পরিবেশগত সমস্যার ওপর। বৃহদাকার পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের উন্নয়নের লক্ষ্যে কারখানা ও সরবরাহ চেইনগুলো ব্যবহার করছে স্মার্ট সেন্সর। বৈশ্বিকভাবে ক্ষেত্রপরিধি (স্পেস) বাড়ছে, যেখানে লোকজন সম্মিলিত হতে পারে শিখতে ও নির্মাণ করতে ইলেকট্রনিকস, সফটওয়্যার ও ডিজিটাল ফ্যাব্রিকেশন। এগুলো পরিচিত ম্যাকারস্পেস নামে। নিজের মতো করে শিখতে ও নির্মাণ করতে এসব স্পেস যন্ত্রে প্রবেশ ও অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতার গণতন্ত্রায়ন করেছে।

আইওটির একটি অন্যতম মুখ্য অ্যাপ্লিকেশন হলো পরিবেশের পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকানো। উন্নয়নশীল দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো মাটির অবস্থার ওপর নজর রাখা ও স্বয়ংক্রিয় সেচব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইন্টেলিজেন্ট সেন্সর ব্যবহার করতে পারে। শহরগুলোতে স্মার্ট ট্রাফিক সিনক্রোনাইজেশন সিস্টেম ভ্রমণ-সময় ও যানবাহনের তেল-খরচ

কমাতে পারে। সিঙ্গাপুরের মতো অনেক দেশ গড়ে তুলছে স্মার্ট নেটওয়ার্ক। এতে ব্যবহার হয় গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস), সেন্সর মনিটরিং ক্যামেরা থেকে নেয় ইনফরমেশন এবং অন্যান্য উৎস থেকে নেয় লোকজনের চলাচল ও যানজটের তথ্য। জরুরি প্রয়োজনে দূর করে এই সমস্যা।

অনেক বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস, আইওটি আনবে ইন্টারনেট উন্নয়নের এক নয়া পর্যায়। কেননা, মানুষের জীবন-যাপন, কাজ, মিথস্ক্রিয়া ও শিক্ষায় বিপ্লব আনায় সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এই আইওটির।

থ্রিডি প্রিন্টিং : থ্রিডি প্রিন্টিং হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যেখানে যন্ত্র ফাইল কিংবা স্ক্যান থেকে অবজেক্ট প্রিন্ট করতে পারে। এতে লেয়ার বা স্তরের পর স্তর যোগ করে তৈরি করা হয় থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট। ম্যানুফেকচারিংয়ে এই প্রযুক্তির রয়েছে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে থ্রিডি প্রিন্টিংয়ে অগ্রগতি হয়েছে মানব দেহাংশ (টাইটেনিয়ামের চোয়াল, মেরুদণ্ড), এক্সোস্কেলেটন, রকেট পার্টস এবং এমনকি খাদ্য প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দাম কমার ফলে ভোক্তাবান্ধব ডিভাইস এখন বাজারে আসছে। এর ফলে মানুষ কমপিউটার-এইডেড ডিজাইন (সিএডি) ফাইল ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে থ্রি ডাইমেনশনাল সলিড অবজেক্ট তৈরি করতে পারছে। আর এই ফাইল ডাউনলোড করা যায় ইন্টারনেট থেকে। থ্রিডি প্রিন্টারে সাধারণত যে কালি ব্যবহার করা হয়, তা হচ্ছে প্লাস্টিক। কিন্তু এপক্সি, রেজিন, সিলভার, টাইটানিয়াম, ইস্পাত, মমসহ আরও কিছু পদার্থ কালি হিসেবে ব্যবহার হয়। থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের বৈপ্লবিক দিকটি নিহিত এর ডিজিটাল প্রকৃতিতে। ভৌত বস্তু পরিণত হয় ডিজিটাল ইনফরমেশনে, যাকে রিমিক্স, রিফরমুলেট, ইমপ্রুভ ও শেয়ার করা যাবে। কিন্তু ডেস্কটপ থ্রিডি প্রিন্টিং এখনও তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। আর এতে প্রচলিত ইনজেকশন মোল্ডিংয়ের তুলনায় ৫০ থেকে ১০০ গুণ এনার্জি ব্যবহার করতে হবে। এর পারফরম্যান্স উন্নীত হলে প্রিন্টার ও এর জোগানের দামও কমে আসবে। তখন থ্রিডি প্রিন্টার ব্যবহার হবে আরও ব্যাপকভাবে। এর সাম্প্রতিক অগ্রগতির মধ্যে সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নির্মাণশিল্পের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে থ্রিডি প্রিন্টেড বিল্ডিং হাউজিং সমস্যার সমাধানের খরচ কমিয়ে আনতে পারে। থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের সম্প্রসারণ ঘটছে উন্নয়নশীল দেশে। যেমন– উগান্ডায় থ্রিডি প্রিন্টিং টেকনোলজি ব্যবহার হচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টেড কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরির কাজে। ভারতের পুনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'প্রটোপ্রিন্ট' সংগ্রহ করা পুরনো প্লাস্টিক থেকে থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের সাহায্যে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করে। হাইতির আইল্যাব (iLab) থ্রিডি প্রিন্টিং ব্যবহার করছে স্থানীয় ক্লিনিকের জন্য মেডিক্যাল (আরবিলিক্যাল ক্ল্যাম্প, ফিঙ্গার স্প্লিন্টস ও কাস্ট) সাপ্লাই ডিজাইনের কাজে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ডিজাইন করা হয়েছে স্পাইরোমিটার। এই ডিভাইস শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ নির্ণয় করতে পারে। হার্ডওয়্যার ও থ্রিডি প্রিন্টিং ব্যবহার করে এই যন্ত্র ডিজাইন করা হয়েছে কজ

শেষকথা

রিপোর্ট মতে, বিশ্বের এমন কতগুলো দেশের মধ্যে একটি হচ্ছে এস্তোনিয়া, যেটি ডিজিটাল সমাজ প্রতিষ্ঠার একদম কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯৯১ সালে এর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর দেশটি সিদ্ধান্ত নেয় সমাজ ও অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল টেকনোলজির উন্নয়ন ঘটাবে। ইউরোপীয় মান বিবেচনায় দেশটি ধনী দেশ নয়। অতএব তাদের একটি লক্ষ্য ছিল দক্ষতা অর্জন। আইসিটিতে বিনিয়োগের সময় এস্তোনিয়া ব্যাপকভাবে উন্নয়ন ঘটায় এর ব্যবসায়ের পরিবেশ, মানবসম্পদ ও গভর্ন্যান্সের। ব্যবসায়ের বিষয়টি সহজ করে তোলার কারণে বিপুলসংখ্যক প্রযুক্তিঘন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল 'স্কাইপি' এবং 'ট্রান্সফার ওয়াইজ'। ট্রান্সফার ওয়াইজ দেশটির মানি ট্রান্সফার ইন্ডাস্ট্রিকে পাল্টে দেয়। দেশটি এখন বিশ্বে PISA (Programme for International Student Assessment) এডুকেশন র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। দেশটি বয়স্ক লোকদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসির জন্য বিনিয়োগ করছে। সরকারের বৃহত্তর জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এস্তোনিয়া ১৪৪ দেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে যেখানে ছিল ৭৮তম স্থানে, ২০১০ সালে উঠে আসে ৪০তম স্থানে। আজকের এস্তোনিয়ায় অ্যাক্সেস রয়েছে ৩০০০ ই-গভর্নমেন্ট, ই-ব্যাংকিং ও অন্যান্য সেবায়। এতে জনপ্রতি বছরে ৫.৪ কর্মদিবস সাশ্রয় হয়েছে। এস্তোনিয়া দেখিয়েছে– একটি ছোট্ট উন্নয়নশীল কিংবা পরিবর্তনকামী দেশও স্মার্ট ও ব্যাপকভিত্তিক ডিজিটাল টেকনোলজি স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করে ইন্টারনেটের দেয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। আরও অনেক দেশও ডিজিটাল টেকনোলজিতে বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু এর প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে এর জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা জোগাতে। অতএব সেসব দেশে ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসার ঘটলেও উন্নয়নের গতি ছিল এরচেয়ে আরও অনেক কম গতির। বাংলাদেশও সেই উদাহরণের অধীন। রিপোর্টটির চতুর্থ অধ্যায়ে সেইসব নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা নিশ্চিত করে সার্বজনীন, আয়ত্তাধীন, নিরাপদ ও অবাধ সুযোগের ইন্টারনেট। এর বিস্তারিতে যাওয়ার অবকাশ এ লেখায় নেই। তবে বলা দরকার– এসব সাপ্লাই-সাইড নীতিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে পর্যাপ্ত নয়। আলোচ্য প্রতিবেদনের প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যন্ত অধ্যায়ে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে– বৃহত্তর পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যেসব সমস্যা দেখা দেয় এবং এসব সমস্যা একটি দেশকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে, সেসব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন এর অ্যানালগ সম্পূরকগুলোতে বিনিয়োগ। আর এখানেই জাতীয়ভাবে প্রাধান্য দেয়া উচিত নীতি-উদ্যোগকে প্রাধিকার দেয়া। এটি আলোচ্য প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য একটি উদঘাটন এবং সেই সাথে বড় ধরনের একটি তাগিদও বটে কজ